কালের কণ্ঠ

তারিখঃ ৩০-০৫-২০২৪ (পৃঃ ০১,০২)

সাক্ষাৎকার

কৃষিতে প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দেশ

কৃষিতে প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস ও ভবিষ্যতের নানা প্রতিবন্ধকতা নিয়ে কালের কণ্ঠ'র সঙ্গে আলাপ করেছেন বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (ব্রি) সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিলের (বিএআরসি) সাবেক নির্বাহী চেয়ারম্যান এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব **অধ্যাপক ড. জহুরুল করিম**। বর্তমানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা ও বাংলাদেশ একাডেমি অব সায়েন্সের ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তিনি। সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **সাইদ শাহীন**

অধ্যাপক ড. জহুরুল করিম

কালের কণ্ঠ : বর্তমান কৃষির অর্জন ও সংকটকে কিভাবে দেখছেন?

অধ্যাপক ড. জহুরুল করিম : কৃষিতে কিছুটা উন্নতি হয়েছে। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ খাতে উন্নতি হয়েছে। গত কয়েক দশকে দেশের খাদ্যশস্যের মধ্যে দানাদার কিছু শস্য ও সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ সফলতা দেখিয়েছে। কিছু ক্ষেত্রে শস্যের উৎপাদনশীলতা বাড়াতে সফল হয়েছি আমরা। অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং বিজ্ঞানী ও গবেষক তৈরি হয়েছে। তবে সেই উন্নতি ধরে রাখার পাশাপাশি সামনের দিনের প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলায় দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট উভয় কারণে কৃষিতে নানা সংকট

▶▶ পৃষ্ঠা ২ ক. ২

কৃষিতে প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দেশ

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

তৈরি হয়েছে। সংকট এখন এমন পর্যায়ে রয়েছে, দ্রুত জরুরিভাবে ব্যবস্থা না নিলে দেশের কৃষিতে মহাবিপদ আসতে বাধ্য। দেশের প্রাণ-প্রকৃতি ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় আমরা একেবারেই উদাসীন। নদী, মাটি ও পানি ব্যবস্থাপনায় আমাদের দীর্ঘমেয়াদি কোনো পরিকল্পনা নেই। আবার কিছু নীতি-পরিকল্পনা থাকলেও বাস্তবায়নের অভাব রয়েছে।

কালের কণ্ঠ : কৃষিতে এই 'মহাবিপদ' বা বড় ধরনের প্রতিবন্ধকতা কোথায় দেখছেন?

অধ্যাপক ড. জহুরুল করিম : কৃষির সঙ্গে যুক্ত প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে রয়েছি আমরা। প্রাণ-প্রকৃতি ধ্বংসের প্রভাব সর্বব্যাপী হবে। নদীতে পানি নেই। নদী হলো একটি দেশের লাইফলাইন বা প্রাণপ্রবাহ। নদীর নাব্যতা সৃষ্টিতে কার্যকর উদ্যোগ সীমিত। সার্বিকভাবে এগুলোর কারণে শস্য উৎপাদন ঝুঁকিতে পড়বে। দেশের বিজ্ঞানী, গবেষকরা দেশে থাকতে চাচ্ছেন না। আবার মাটির উর্বরাশক্তি ধরে রাখতে পারছি না। মাটিকে আমরা মেরে ফেলছি। আবার জলবায়ুর পরিবর্তনের নানামুখী ঝুঁকি মোকাবেলা করতে হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এরই মধ্যে পরিবর্তন শুরু হয়েছে। কৃষির জন্য সার্বিকভাবে ইকোসিস্টেম খুব গুরুত্বপূর্ণ। তা আমরা রক্ষা করতে পারছি না। ভূগর্ভস্থ পানির টেকসই ব্যবস্থাপনায় আমরা এখনো উদাসীন। কৃষিকাজে ভূগর্ভস্থ পানির ওপর নির্ভরশীলতা বেড়ে চলেছে। এ কারণে অনেক নেমে যাচ্ছে পানির স্তর। বেশির ভাগ অঞ্চলেই মাটির অনেক গভীরে যেতে হচ্ছে। এ অবস্থায় আমাদের অর্থনৈতিক উন্নতি হলেও ইচ্ছামতো কিন্তু খাবার কিনতে পারব না। বিশ্বে যদি খাদ্য উদ্বৃত্ত না থাকে তাহলে খাবার আনবেন কোথা থেকে? ফলে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি দরকার। বিশেষ করে কৃষিতে বিনিয়োগ বাড়ানো দরকার। গবেষণা ও উদ্ভাবনের জন্য সহায়ক পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন।

কালের কণ্ঠ : কৃষিতে মেধাবী বিজ্ঞানী ও গবেষকদের ধরে রাখা যাচ্ছে না কেন? এটার কারণে কী ক্ষতি হতে পারে?

অধ্যাপক ড. জহুরুল করিম : কৃষির অগ্রগতি ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার জন্য বিজ্ঞানের সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে। গবেষক ও বিজ্ঞানী তৈরিতে আরো দায়িত্বশীল হতে হবে। বিজ্ঞানীদের বিদেশ চলে যাওয়া বন্ধ না করতে পারলে কৃষি মুখ থুবড়ে পড়বে। প্রতিবছর একটি বৃহৎসংখ্যক বিজ্ঞানী-গবেষক দেশের বাইরে গিয়ে আর ফিরে আসছেন না। এটি দেশের জন্য অশনিসংকেত। কৃষিশিক্ষার গুণগত মানের উন্নয়ন এবং ভালো ছাত্র-ছাত্রী যাঁরা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় বা বিজ্ঞান বিষয়ে পড়ালেখা করছেন, তাঁদের উচ্চশিক্ষা অর্জনের জন্য বিদেশে পাঠানো প্রয়োজন। তবে সেখান থেকে যাতে তাঁরা ফিরে আসেন তার ব্যবস্থা করতে হবে। এ জন্য দেশে এসে যাতে তাঁরা সুবিধা ও পছন্দমতো কাজ করার প্রণোদনা পান, সে নিশ্চয়তা দিতে হবে। বিদেশি গবেষণাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করতে হবে আমাদের। এটা সরকারি-বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রেই হতে পারে। এ ছাড়া প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন, বিশেষ করে জিনোম এডিটিং কাজে লাগাতে হবে।

কালের কণ্ঠ : কৃষির উন্নয়নে মাটির উর্বরাশক্তি ধরে রাখা কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

অধ্যাপক ড. জহুরুল করিম : মাটি হলো শস্যের মা। সেই মাকে পুষ্ট রাখতে না পারলে কৃষির জন্য বিপদ বাড়বে। মাটি প্রতিনিয়ত নষ্ট হচ্ছে। আবার প্রতিবছর বিশাল আবাদি জমি অকৃষি কাজে ব্যবহারে চলে যাচ্ছে। ভূমিক্ষয়, লবণাক্ততা ও অম্লতা বৃদ্ধি, মাটির পুষ্টি উপাদান হ্রাস, ভারী ধাতু দূষণ ইত্যাদির মাধ্যমে দেশের ভূমির অবক্ষয় হচ্ছে। জীববৈচিত্র্য রক্ষা করা, টেকসই কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা জোরদার করা, দারিদ্র্য দূরীকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, জলবায়ুর পরিবর্তন মোকাবেলা ও পানির সহজলভ্যতা বাড়াতে সুষ্ঠু মাটি বা ভূমি ব্যবস্থাপনার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। গুণগত কৃষিজমি রক্ষাই হবে আগামীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রাকৃতিক বিপর্যয়, খাদ্যপণ্যের জন্য বিদেশের ওপর নির্ভরশীলতা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে খাদ্যপণ্যের দাম বৃদ্ধি দেশের খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের পথে প্রধান বাধা। তাই ভূমির সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দেশের খাদ্য নিরাপত্তাকে জোরদার করতে হবে।

কালের কণ্ঠ : গবেষণা ও সম্প্রসারণকর্মীদের মধ্যে সমন্বয় কতটা গুরুত্বপূর্ণ?

অধ্যাপক ড. জহুরুল করিম : প্রাকৃতিক দুর্যোগ, যেমন—বন্যা, খরা, লবণাক্ততাসহ নানা কারণে দেশের যেসব স্থানে উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, সেখানে প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর জোর দিতে হবে। এরই মধ্যে খরা, বন্যা ও লবণাক্ততা সহিষ্ণু ধানের উদ্ভাবন হয়েছে। কিন্তু জাতগুলো দ্রুত কৃষকের কাছে পৌঁছাতে হবে। বিশেষ করে জাত উদ্ভাবনে সময় গ্যাপ কমিয়ে আনতে হবে। যে মাত্রায় লবণ বাড়ছে সে মাত্রায় লবণসহিষ্ণু জাত দ্রুত আসছে না। আবার যেসব জাত উদ্ভাবন হচ্ছে, সেগুলো মাঠে দ্রুত পৌঁছাচ্ছে না। উন্নত কৃষিশিক্ষার পাশাপাশি গবেষণাপ্রতিষ্ঠান ও গবেষকদের সক্ষমতা বাড়াতে হবে। এর মাধ্যমে যেসব প্রযুক্তি উঠে আসবে, সেগুলো কৃষকের কাছে নিয়ে যেতে হবে। বিশ্ব এখন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলা করছে। তাই সার্বিকভাবে গবেষক ও উদ্ভাবক এবং সম্প্রসারণকর্মীদের মধ্যে সমন্বয় রেখেই কাজ করতে হবে, যাতে কৃষক দ্রুত সেটি থেকে সুফল পেতে পারে।

দৈনিক ইত্তেফাক
প্রতিষ্ঠাতা তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া

তারিখঃ ৩০-০৫-২০২৪ (পৃঃ ০১,১৫)

গোল্ডেন রাইস নিয়ে কৃষিবিজ্ঞানী ও সুশীল সমাজের টানাপড়েন

অনুমোদন নিয়ে অনিশ্চয়তা

■ নিজামুল হক

দরিদ্র মানুষের ভিটামিন 'এ'র ঘাটতি পূরণের লক্ষ্যে ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ব্রি) উদ্ভাবন করেছে 'গোল্ডেন রাইস। কিন্তু দীর্ঘ সময়েও এ ধানের জৈবনিরাপত্তা বিষয়ক অনুমোদনও মেলেনি। ইতিমধ্যে ধান গবেষণার আন্তর্জাতিক সংস্থা ইরির প্রতিনিধিরা বাংলাদেশে এসে এই ধানের অনুমোদন দিতে সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন। অন্যদিকে এই ধানের অনুমোদন না দিতে সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছে বাংলাদেশের সুশীল সমাজের পৃষ্ঠা ১৫ কলাম ১

গোল্ডেন রাইস নিয়ে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রতিনিধিরা। ফলে দেড় যুগ ধরে গবেষণা করে উদ্ভাবন করা এই ধানের অনুমোদন নিয়ে এক প্রকার অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

গোল্ডেন রাইস বা সোনালি চাল হলো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মাধ্যমে উদ্ভাবিত একধরনের পুষ্টি চাল, যাতে রয়েছে বিটা ক্যারোটিন। 'প্রোভিটামিন-এ' এই উদ্ভিদ রঞ্জকটি খাবার পর শরীর প্রয়োজন অনুযায়ী 'ভিটামিন এ'তে রূপান্তর করে। এই যৌগটির কারণে শস্যটি হলুদ-কমলা বা সোনালি রঙ ধারণ করায় এর নাম হয়েছে 'গোল্ডেন রাইস' বা 'সোনালি চাল'।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে বিআর-২৯ জাতের ধানের সঙ্গে ভুট্টার জিন মিলিয়ে এই গোল্ডেন রাইসের জাতটি উদ্ভাবন করা হয়েছে। ২০০৬ সাল থেকে বাংলাদেশে এই ধান নিয়ে কাজ শুরু করে ব্রি। সরকারি এই সংস্থাটি বলছে, একজন মানুষের 'ভিটামিন-এ'র দৈনিক যে চাহিদা, তার ৩০ থেকে ৫০ শতাংশ পর্যন্ত গোল্ডেন রাইসের মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব। বাকি চাহিদা ফলমূল, শাকসবজি বা প্রাণিজ উৎস থেকে পূরণ করা যেতে পারে।

তথ্য অনুযায়ী, ২০০৬ থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত মোট আট বছর এই ধান নিয়ে গবেষণা করে ব্রি। কিছু পরীক্ষানিরীক্ষা শেষে ২০১৭ সালে কৃষি মন্ত্রণালয়ের কাছে গোল্ডেন রাইসের জৈবনিরাপত্তা (বায়োসেফটি) বিষয়ক অনুমোদনের জন্য আবেদন করে ব্রি। কিন্তু পরিবেশগত ছাড়পত্র না পাওয়ায় এ চাল উৎপাদন ও বাজারজাতের সুযোগ মিলছে না। ব্রি ও পরিবেশ অধিদপ্তরের চিঠি চালাচালিতেই এখন সময় পার করছে।

গবেষণার শুরু থেকেই গোল্ডেন রাইস নিয়ে কৃষিবিজ্ঞানী এবং পরিবেশ নিয়ে কাজ করা সংগঠনগুলো পক্ষে-বিপক্ষে নানা ধরনের প্রচার-প্রচারণা শুরু করে। পালটাপালটি সভা-সেমিনারও হয়েছে।

ব্রিসহ বিভিন্ন কৃষি গবেষণা সংস্থাগুলো এই ধানের পক্ষে বিভিন্ন ধরনের সভা সেমিনার করে যাচ্ছেন। পাশাপাশি পরিবেশবাদী সংগঠনসহ সুশীলসমাজের প্রতিনিধিরা এই ধানের বিভিন্ন ক্ষতিকারক দিক তুলে ধরে সভা সেমিনার ও সংবাদ সম্মেলন করছেন।

গত এপ্রিল মাসে ইরির একটি প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে গোল্ডেন রাইস ধানের জাত অবমুক্তির জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ করেছে। আর সরকার অনুমোদনের আশ্বাসও দিয়েছে। এতে ক্ষুব্ধ হয়েছে সুশীলসমাজের প্রতিনিধিরা।

তথ্য বলছে, আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ইরি) ফিলিপাইনে অবস্থিত। এই দেশটি ২০২১ সালে ভিটামিন-এ সমৃদ্ধ গোল্ডেন রাইস অনুমোদন দেয়। তবে এর তিন বছর পর চলতি বছরের ১৭ এপ্রিল ঐ 'গোল্ডেন রাইস' নামের ধান উৎপাদন এবং তা বাণিজ্যিকীকরণে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে ফিলিপাইনের একটি আদালত। এই ধান উৎপাদন পরিবেশ এবং মানবদেহের জন্য মারাত্মকভাবে ঝুঁকিপূর্ণ বলে জানিয়েছে ঐ আদালত। ১৪টি পরিবেশবাদী সংগঠন এর বিরোধিতা করে আদালতে মামলা করেছিল। বাংলাদেশ সুশীলসমাজের প্রতিনিধিরা এ বিষয়টিও সামনে নিয়ে এসেছেন।

তারা বলছেন, অন্য কোনো দেশ গোল্ডেন রাইসের বাণিজ্যিক অনুমোদন দেয়নি। ফিলিপাইনের আদালত সুনির্দিষ্টভাবে এ অনুমোদনের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। বাংলাদেশে ভিটামিন 'এ'র বিকল্প প্রাকৃতিক উৎস সহজলভ্য। অথচ এদেশে ভিটামিন 'এ' বেশি পাওয়ার অজুহাতে জিনগতভাবে পরিবর্তিত ও কোম্পানির পেটেন্টকৃত গোল্ডেন রাইসের বাণিজ্যিক প্রচলন করার কোনো সুযোগ নেই। বিটি বেগুন বাংলাদেশ, ভারত ও ফিলিপাইন একই সঙ্গে পরীক্ষানিরীক্ষা শুরু করলেও বাংলাদেশ ছাড়া ভারত কিংবা ফিলিপাইন বাণিজ্যিক প্রচলনের অনুমোদন দেয়নি।

এ বিষয়গুলো তুলে ধরে চলতি সপ্তাহে একটি বিবৃতিতে দিয়ে এ ধানের অনুমোদন না দিতে সরকারের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন ১৮টি বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধিরা। চিঠিতে মানবাধিকার কর্মী সুলতানা কামাল, 'নিজেরা করির' সমন্বয়কারী খুশী কবির, উবিনীগের নির্বাহী পরিচালক ফরিদা আখতার, টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান, বেলার প্রধান নির্বাহী সৈয়দা রিজওয়ানা হাসানসহ বিশিষ্ট নাগরিকরা স্বাক্ষর করেছেন। তারা বলছেন, বাংলাদেশের মতো প্রাণবৈচিত্র্য নির্ভরশীল দেশে জিনগতভাবে পরিবর্তিত ধান ও খাদ্য ফসলের প্রবর্তন উদ্বিগ্ন করেছে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের।

পরিবেশ সংগঠনগুলোর প্রতিনিধিরা বলছেন, ব্রি-২৯-এর পেটেন্ট সিনজেন্টা কোম্পানিকে দিয়ে দেওয়া হলে দেশের কোটি কোটি কৃষকের ধানের এই জাত চাষ করা অধিকার ক্ষুণ্ন হবে।

তবে এর জবাবে কৃষিবিজ্ঞানীরা বলছেন, ব্রি ধান-২৯ (গোল্ডেন রাইস)-এর পেটেন্ট সিনজেন্টা কোম্পানিকে দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। এটা আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের (ইরি) কারিগরি সহায়তায় ব্রি বিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত একটি জাত। ব্রি উদ্ভাবিত অন্য ১১৫টি জাতের মতো এর স্বত্ব কেবল ব্রির হাতেই থাকবে। যার বীজ কৃষক নিজেই উৎপাদন, সংগ্রহ, সংরক্ষণ, বাজারজাত ও ব্যবহার করতে পারবে।

বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. মো. শাহজাহান কবীর বলেন, ব্রি বা এর বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যউপাত্তের ভিত্তিতে কথা বলে, অনুমান বা আবেগের ভিত্তিতে নয়। ব্রির বিজ্ঞানীরা বহু বছর ধরে এই চাল নিয়ে নানাবিধ পরীক্ষানিরীক্ষা চালিয়ে নিশ্চিত হয়েছেন যে, এটি মানব শরীর, পশুপাখি ও পরিবেশের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ। ব্রি ধান-২৯ যতটুকু নিরাপদ, গোল্ডেন রাইসও ততটুকুই নিরাপদ। যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) এই চাল পরীক্ষা করে বলেছে এটি সম্পূর্ণ নিরাপদ। একই কথা বলেছে হেলথ কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়া-নিউজিল্যান্ডের ফুড স্ট্যান্ডার্ডসের মতো প্রতিষ্ঠানও। বিশ্বের কোনো গবেষণা বা কোনো জার্নালে জিএম ফসলের পরিবেশ, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য ঝুঁকির বিষয়টি প্রমাণিত হয়নি।